



ଅର୍ଧ୍ୟାୟ ୧୧

ମାନୁଷ ଶରୀର

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- প্রাণীজগতে মানুষের শরীরবৃত্তির অবস্থান
- মানব শরীরের অপ-প্রত্যঙ্গসমূহ
- গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের গঠন ও কাজ
- শরীরের যত্ন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

জীবাশ্ম বা ফসিল বনতে কী ঘোঝায়?



প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো জীবের শরীরের অংশ যখন মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়ে, বা অন্য কোনো উপায়ে বহু বছর ধরে সংরক্ষিত হয় তাকে বলে জীবাশ্ম বা ফসিল। প্রাচীন পৃথিবীর উত্তিদ বা প্রাণীদের সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় উৎসই হলো সেই সময়ের প্রাণ জীবাশ্মের নমুনা। যেমন— আমরা তো সবাই ডাইনোসরের কথা জানি। এই বিশাল বিশাল প্রাণীরা একসময় পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত। ডাইনোসরদের কালে তো আর মানুষ ছিল না, তাদের কেউ দেখেওনি! কিন্তু এই প্রাণীদের সম্পর্কে এখন এই যে এত কিছু জানা যায়, তার প্রধান উৎস কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া ডাইনোসরের ফসিল বা জীবাশ্ম!

আমরা যদি আমাদের চারপাশে তাকাই তবে নানান রকম জীব দেখতে পাবো। যেমন গাছ, শালিক, কবুতর, মুরগী, হাঁস, মাছ, বিড়াল, কুকুর, ছাগল, গরু ইত্যাদি। এগুলোর পাশাপাশি আরও যে জীবটি আমরা অনেক অনেক দেখতে পাবো, তা হচ্ছে মানুষ। মানুষও অন্য সকল জীবের মতোই জীবন ধারণ করে। সে চলাচল করতে পারে। তাই সে হচ্ছে প্রাণী।

ছোটবেলা থেকেই আমরা অবাক হয়ে ভাবি ‘কোথা থেকে এসেছি আমরা’, ভাবি ‘অন্য প্রাণীদের চেয়ে আমরা কীভাবে আলাদা’। অন্য সব জীবের যেমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আমাদেরও তেমন রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখতে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে ভিন্নতর, আমাদের হাঁটার ধরন, খাদ্যভ্যাস, চিন্তার ক্ষমতা সবকিছুতেই রয়েছে অন্য প্রাণীদের তুলনায় আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। ‘আধুনিক’ মানুষই (বৈজ্ঞানিক নাম Homo sapiens) একমাত্র প্রাণী যারা সোজা হয়ে দুই পায়ে চলাচল করতে পারে। তবে এই আধুনিক মানুষের আগেও মানুষের কিছু আদি প্রজাতি ছিল যারা কিন্তু এভাবে সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটতে পারত। বিবর্তন (Evolution) বিষয়ে গবেষণা আমাদের সেটা বুঝতে সাহায্য করে।

আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে পাওয়া ফসিল (Fossil) বা জীবাশ্মগুলোর বিস্ময়কর উপস্থিতি এবং ক্রম-বিস্তৃতি থেকে আমরা আমাদের বিবর্তনকে বুঝতে

পারি। জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে আমরা বুঝতে পারি কখন আমরা সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। আকারগত পরিবর্তনগুলো যেমন আমাদের শরীরের চওড়া নিতম্ব (পশ্চাত্ভাগ), পায়ের বাকি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পায়ের বড় আঙুল এবং ছোট বাহু কখন পেয়েছি। বিবর্তনের ধারায় আমাদের মস্তিষ্কের আকার ও বেড়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাণ্ট গবেষণাতথ্য বলছে, প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশে মানুষের অস্তিত্ব ছিলো। আমাদের চেনাজানা প্রাণীদের ভেতর বানর, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি এরা মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। মানুষসহ এসব প্রাণীদের বলা হয় প্রাইমেট (Primate)।

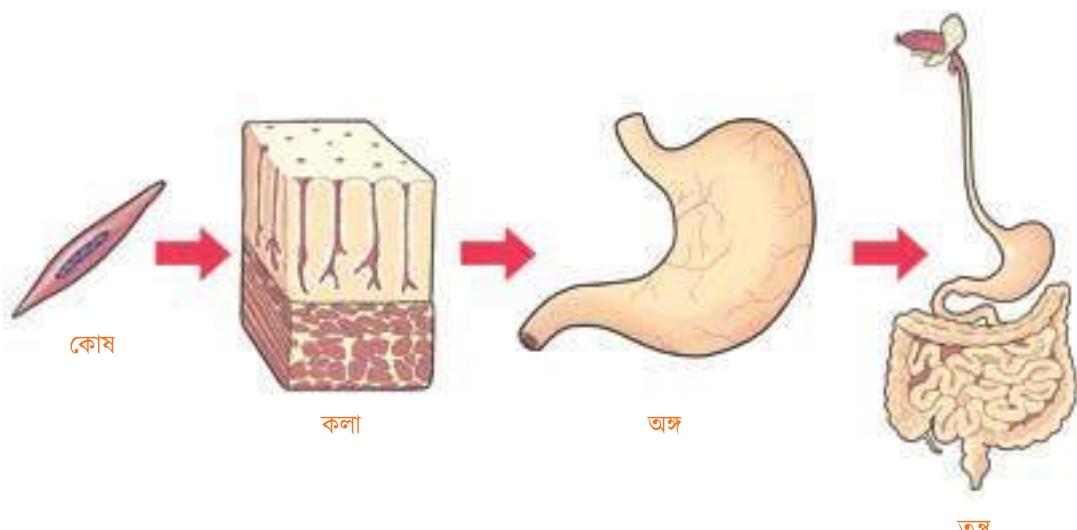
সকল প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর তা হচ্ছে এদের শরীরের মেরুদণ্ডের উপস্থিতি। আমাদের পিঠের মাঝ বরাবর যে খঙ্গ খঙ্গ হাড়ের উপস্থিতি আমরা হাত দিলেই অনুভব করতে পারি এটিই আমাদের মেরুদণ্ড, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় spine।

আমাদের শরীরের দিকে তাকালে আমরা চোখ, কান, নাক, মাথা, শরীরের ত্বক বা চামড়া, নখ ইত্যাদি দেখতে পাই। এছাড়া আমাদের শরীরের ভেতরে রয়েছে আমাদের হৃৎপিণ্ড (heart), যকৃত (liver), ফুসফুস (lungs), বৃক্ক (kidney), অগ্নাশয় (pancreas) ইত্যাদি। এগুলো আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। আমাদের পরিচিত অন্যান্য প্রাণী, যেমন—হাঁস, মুরগী, গরু এদেরও কিন্তু এসব অঙ্গ রয়েছে।

আমাদের নখ আমরা খালি চোখেই দেখতে পাই। হাত-পায়ের নখ বড় হলে আমরা কেটে ফেলি। এই নখকে যদি আমরা ক্রমাগত ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে থাকি, তবে একপর্যায়ে এসব টুকরোকে আর খালি চোখে দেখা যাবে না। তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এগুলো দেখতে হবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শেষ পর্যন্ত নখের কোষ দেখতে পাব। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি কোষ হচ্ছে আমাদের গঠন ও কাজের একক। মানুষের মতো জটিল গঠনের জীবের জন্য কোটি কোটি কোষ দরকার। এসব কোষ একে অপরের সঙ্গে মিলে শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো মানুষের গঠন তৈরি করে।

আণুবীক্ষণিক কোষ থেকে শুরু করে খালি চোখে দেখতে পাওয়া মানব শরীরের এই গঠনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানীরা নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আলোচনা করেন।

কোষ (cell) > টিস্যু বা কলা (tissue) > অঙ্গ (organ) > তন্ত্র (system)



বিজ্ঞান

কোষ হচ্ছে গঠনের এই ধাপের সবচেয়ে নিচের কিংবা বলা যেতে পারে সবচেয়ে সরল একক। আর তন্ত্র বা সিস্টেম হচ্ছে এই গঠনের সবচেয়ে ওপরের ধাপ।

আমরা নিচে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব।

কোষ (Cell)

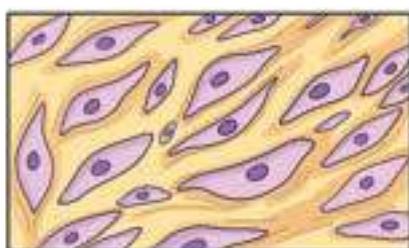
একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে মোট কত কোষ থাকে? এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভেতর অনেক দিনের প্রশ্ন ছিল। সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় ৩০-৪০ ট্রিলিয়ন (৩০০০০০০-৪০০০০০০০ কোটি)। এই কোটি কোটি কোষ মানব শরীরের বৃদ্ধি, বিপাক, উদ্দীপনা এবং প্রজননে ভূমিকা রাখে।

প্রাণীকোষের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা সবই মানুষের কোষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।



কলা বা টিস্যু (Tissue)

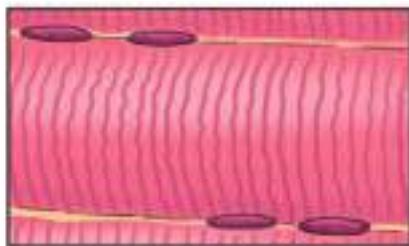
মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কোষ রয়েছে। এদেরকে চারটি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই চার ধরনের কোষ, তাদের চারপাশের উপাদানের সঙ্গে মিলে যে বিশেষ গাঠনিক একক তৈরি করে এদেরকে বলা হয় টিস্যু বা কলা। চার শ্রেণির কোষের ওপর ভিত্তি করে মানব শরীরের টিস্যুগুলোকে চারটি ধরনে ভাগ করা যায়।



সংযোজক কলা



বহিরাবরণীয় কলা



পেশী কলা



মায়ুকলা

ধরন-১: এই ধরনের কলা বা টিস্যু আমাদের শরীরের বাইরের আবরণ এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ও শরীরের গহ্বরগুলোর বাইরের স্তরটিকে ঢেকে রাখে। এদেরকে বলা হয় বহিরাবরণীয় কলা বা এপিথেলিয়াল টিস্যু (epithelial tissue)।

ধরন-২: এ ধরনের টিস্যু সংকোচন ও প্রসারণ করতে সক্ষম এবং শরীরের পেশি গঠন করে। এদেরকে বলা হয় পেশি কলা বা মাসল টিস্যু (muscle tissue)।

ধরন-৩: এ ধরনের টিস্যু আমাদের শরীরের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্র তৈরি করে। এদেরকে বলা হয় স্নায়ুকলা বা নার্ভ টিস্যু (nerve tissue)।

ধরন-৪: এই টিস্যুগুলো দূরবর্তী কোষগুলোকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত করে, এবং শরীরের কাঠামোকে একত্রিত করে। এদেরকে বলা হয় সংযোজক কলা বা কানেক্টিভ টিস্যু (connective tissue)।

অংশ (Organ)

উপরে উল্লিখিত চার ধরনের টিস্যু বা কলা মিলে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি করে। এক একটি অঙ্গ হচ্ছে একাধিক টিস্যুর সমন্বয়ে তৈরি, যা একটি স্বতন্ত্র গাঠনিক এবং কার্যকরী একক তৈরি করে। মানব শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ আছে। এসব অঙ্গ আমাদের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—হৎপিণ্ড, ঘৃৎ, ফুসফুস, বৃক্ষ ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের শরীরের এক একটি অঙ্গ।

মানব শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো আমাদের ত্বক (skin)।

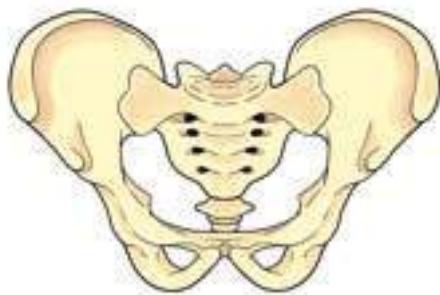
তন্ত্র (System)

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কিন্তু আলাদা আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। বরং এদের কোনো কোনোটি একসঙ্গে মিলে আমাদের শরীরে একই ধরনের কাজ করে। কাজের ভিত্তিতে এই অঙ্গগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ভাগকে বলা হয় একটি সিস্টেম বা তন্ত্র। যেমন—আমাদের হৎপিণ্ড হচ্ছে এমন একটি অঙ্গ যার গঠনে উপরে উল্লিখিত চার ধরনের টিস্যুই অংশগ্রহণ করে। এই অঙ্গটির কাজ হচ্ছে, আমাদের সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনে ভূমিকা রাখা। তবে রক্ত সঞ্চালনের এই কাজটি হৎপিণ্ড একা করতে পারে না। এই কাজের জন্য এটিকে রক্তালিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত ব্যবস্থা বা সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করতে হয়। এই পুরো সিস্টেমকে বলা হয় রক্ত সংবহনতন্ত্র। এভাবে আমাদের শরীরের নানা অঙ্গ যেগুলোর নাম আমরা জানি, যেমন কিডনি, লিভার, ফুসফুস, চোখ, নাক এবং অন্যান্য অঙ্গসমূহ—সেগুলোও কাজের জন্য অঙ্গ এবং টিস্যুর ওপর নির্ভর করে।

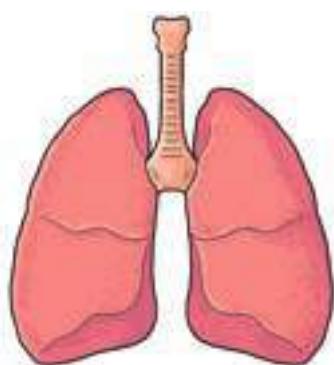
নিচে আমরা মানব শরীরের প্রধান তন্ত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানবো।

১. ত্বকতন্ত্র (Integumentary system): অনেক সময় খেলতে গিয়ে বা ছোটখাটো দুর্ঘটনায় হাত-পায়ের চামড়া কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়। আমাদের পুরো শরীরের ওপরে এই যে চামড়া বা ত্বকের আবরণ, তা বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের শরীরের একটা আবরণ বা প্রতিরক্ষা দেওয়াল তৈরি করে এবং আমাদের শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। আমাদের শরীরের এই ত্বক দ্বারা গঠিত তন্ত্র হচ্ছে ত্বকতন্ত্র। ক্ষতিকর অণুজীব (Microorganisms) এবং রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে ত্বকতন্ত্র।

২. পেশি ও কঙ্কালতন্ত্র (Muscular and skeletal systems): আমরা যখন হাঁটি, কিংবা একটি ফ্লাসে করে পানি পান করি, তখন আমাদের শরীরের হাড় (Bones) এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশি (Muscle) এই কাজগুলোর ভার সহ করে এবং প্রয়োজনীয় সঞ্চালন শক্তি দেয়। আমাদের শরীরের হাড় বা কঙ্কাল (Skeleton) এবং তার সাথের মাংসপেশি মিলে যে তন্ত্র তৈরি করে তাকে পেশি-কঙ্কালতন্ত্র বলে। একে অনেক সময় আলাদা করে পেশি এবং কঙ্কালতন্ত্র হিসেবে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়। মানুষের শরীরের কঙ্কালতন্ত্র প্রায় ২০৬টি হাড় নিয়ে গঠিত। পেশিতন্ত্র কঙ্কালতন্ত্রের সঙ্গে মিলে শরীরকে চলাচলে সাহায্য করে এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে।

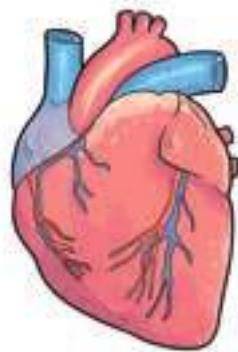


ছবি: হাড়



ছবি: ফুসফুস

৩. শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system): আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমাদের এই শ্বাস-প্রশ্বাসকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের ফুসফুস এবং তার সঙ্গে আরও কিছু অঙ্গ কাজ করছে। আমাদের শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ, ফুসফুস (Lungs) এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশিগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয় শ্বসন তন্ত্র। শ্বসনতন্ত্র বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বাতাসে ফিরিয়ে দেয়।



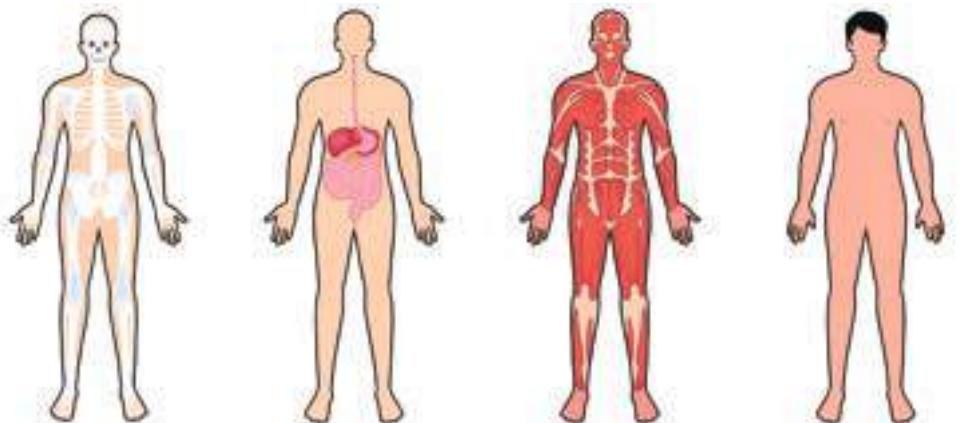
ছবি: হৎপিণি

৪. সংবহনতন্ত্র / হৃদ-সংবহন তন্ত্র (Vascular system): আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের ভেতর যোগাযোগের জন্য রক্তের মাধ্যমে তৈরি হওয়া একটি কার্যকর পরিবহণব্যবস্থা আছে। হৎপিণি শরীরের রক্ত সঞ্চালন করে, রক্তনালির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও কোষে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ করে এবং সেসব জায়গায় সৃষ্টি বর্জ্য পদার্থ পরিবহণ করে। এই হৎপিণি (Heart), রক্ত (Blood) এবং রক্তনালি (blood vessels and capillaries) গুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় সংবহনতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি উপাদান পৌছে দেওয়া, বর্জ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি আমাদের শরীরের তাপমাত্রা সব সময় যে একই থাকে (জ্বর ছাড়া) তা নিয়ন্ত্রণ করে এই সংবহন তন্ত্র।



ছবি: পাকস্থলি

৫. পরিপাক/পাচনতন্ত্র (Digestive system): আমরা সবাই ক্ষুধা পেলে খাবার খাই। এই খাবার কিন্তু সরাসরি আমাদের শরীরে কাজে লাগে না। খাবার থেকে শক্তি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে শরীরের কাজের জন্য উপযোগী করে আমাদের পরিপাকতন্ত্র। মুখ, খাদ্যনালি (Esophagus), পাকস্থলি (Stomach), ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) ও বৃহদ্বর্ত্র (Large intestine)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিপাক/পাচনতন্ত্র। এই তন্ত্র আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যকে ব্যবহারযোগ্য পুষ্টি উপাদানে ভেঙে দেয়, যা পরে আমাদের শরীরে শোষিত হয়। এই তন্ত্রের শেষ অংশ হচ্ছে পায়ু বা মলঘার (Anus),

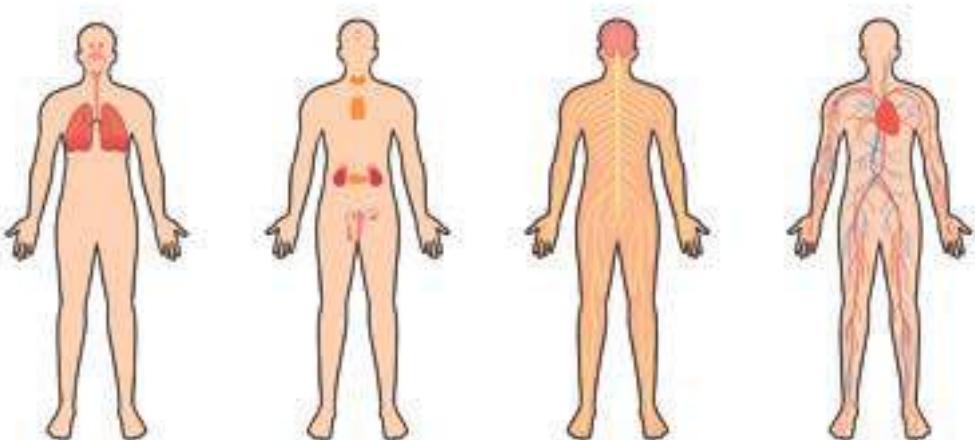


কক্ষালত্ত্ব

পরিপাকত্ত্ব

পেশিত্ত্ব

ত্বকত্ত্ব

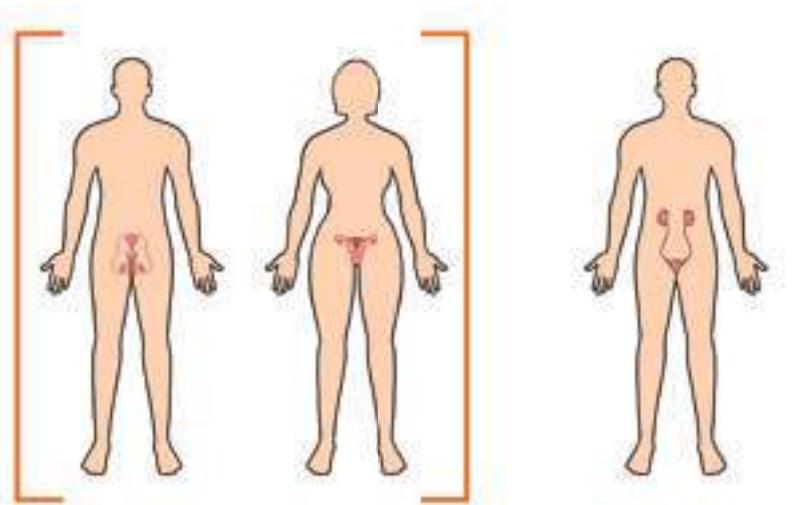


শ্বসনত্ত্ব

অস্তঃকরা গ্রহিত্ত্ব

ন্যাযুত্ত্ব

সংবহনত্ত্ব



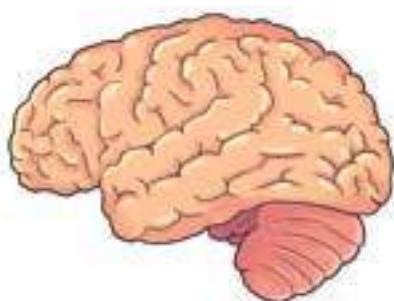
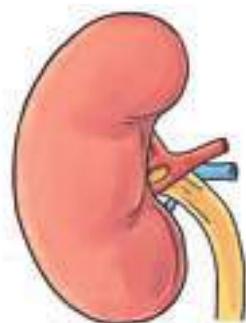
পুরুষ (বামে) ও স্ত্রী (ডানে) প্রজননত্ত্ব

রেচনত্ত্ব

ছবি: মানব শরীরের প্রধান তন্ত্রসমূহ

যা আমাদের খাবারের অব্যবহারযোগ্য বা বর্জ্য অংশকে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার পথ হিসেবে কাজ করে।

৬. রেচনতন্ত্র (Renal system): আমাদের শরীর থেকে তরল বর্জ্য বা মৃত্র যাতে শরীরের বাইরে বের হয়ে আসতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের রেচনতন্ত্র কাজ করে, যা মূলত আমাদের বৃক্ষ (Kidney), মূত্রনালি (Ureter) এবং মূত্রথলি (Bladder) ইত্যাদি অঙ্গ মিলে তৈরি হয়। মৃত্র উৎপাদন এবং এর মাধ্যমে রক্ত থেকে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন যৌগ এবং অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ করে এই তন্ত্র।



ছবি: মস্তিষ্ক

৭. স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system): আমরা যে চিন্তা করতে পারি, সিদ্ধান্ত নিতে

ছবি: বৃক্ষ বা কিডনি

পারি, কারও ডাকে সারা দিতে পারি, শীত-গরম উপলব্ধি করতে পারি তা সম্ভব হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কারণে। আমাদের মস্তিষ্ক (Brain), মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থানরত মেরুরজ্জু (spinal cord) এবং আমাদের শরীরের নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা স্নায়ু-সংযোগ মিলে তৈরি হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। গরম কোনো জিনিসে হাত লেগে গেলে আমরা যখন ঝাট করে হাতটা সরিয়ে নিই, তখন আসলে কী ঘটে? জিনিসটা যে গরম

সেই তথ্য হাতের ত্বকে থাকা স্নায়ুতন্ত্র মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা মেরুরজ্জুর মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্কের কাজ হলো এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের অনুভূতি আর সাড়া দেওয়ার তাড়না সৃষ্টি করা। তার মানে এই ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক আমাদের হাতের ত্বকে যে শুধু গরম লাগার যে অনুভূতি তৈরি করে তাই নয়, বরং হাতটা ঝাট করে সরিয়ে ফেলতেও নির্দেশ দেয়।

৮. অতঙ্করা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system): আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ হয়। এদের কোনোটি শরীরের একটি অংশে তৈরি হয়, কিন্তু তারপর শরীরের বিভিন্ন অংশে গিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। এ ধরনের পদার্থকে বলা হয় হরমোন। এই হরমোনগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশে থাকা গ্রন্থিতে তৈরি হয়, আর এই গ্রন্থিগুলো মিলে তৈরি হয় অতঙ্করা গ্রন্থিতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য এই তন্ত্র রাসায়নিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে।

৯. প্রজননতন্ত্র (Reproductive system): অন্য সকল জীবের মতো মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে মানব প্রজাতির ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের শরীরে রয়েছে প্রজননতন্ত্র। এই তন্ত্রের কিছু অংশ বাহ্যিক অঙ্গ হিসেবে দেখা যায় যা নারী-পুরুষের শরীরে আলাদা। যেমন- ছেলেদের পুঁজননেন্দ্রীয় বা শিশু (penis), অগুকোষ (scrotum), আর মেয়েদের যোনিপথ (vagina)। তবে প্রজননতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসলে আমাদের দৃষ্টির বাইরে, শরীরের ভেতরে অবস্থান করে। যেমন- ছেলেদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়, প্রোস্টেট, শুক্রনালি ইত্যাদি; আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়, জরায়ু ইত্যাদি। প্রজননতন্ত্রের এসব অভ্যন্তরীণ অঙ্গ আমাদের প্রজননকোষ, যেমন- শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরি করে।

বয়ংমান্তি

সকল জীবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শারীরিক বৃদ্ধি এবং পরবর্তী বংশধর তৈরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।

আমরা যখন মাঠে কোনো ফসলের বীজ বপন করি, তখন বীজগুলো থেকে অঙ্কুর গজায়, তারপর তারা ধীরে ধীরে বড় হয়। এক পর্যায়ে সেই গাছে আবার ফুল আসে, তাতে আবার নতুন বীজ তৈরি হয়। এভাবেই প্রকৃতিতে জীবসমূহ তাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্ম তৈরির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে।

মানব প্রজাতির ক্ষেত্রেও কথাটি সত্যি। আমরা চারপাশে তাকালে ছোট ছোট শিশু দেখতে পাই, তারপর তাদের তুলনায় বড় কিশোর বয়সীদের দেখি। আমাদের বাবা-মায়েরা পূর্ণ বয়স্ক মানুষ আবার আমাদের দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানিরা হয়তো আরেকটু বেশি বয়স্ক। এই যে নানান বয়সের মানুষ, তাদের শরীরের বৃদ্ধি কিন্তু ধাপে ধাপে হয়। আমাদের পরিবারে বা আঞ্চলিক জনদের নতুন শিশু জন্ম নেওয়ার পরপরই কেবল আমরা তাদেরকে চোখের সামনে বড় হতে দেখি। কিন্তু মানব শিশু জন্মের এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু শুরু হয় আরও অনেক আগে থেকে মায়ের গর্ভে। সেই বিষয়ে আমরা উপরের শ্রেণিতে আরও বিস্তারিত জানবো।

জন্ম নেওয়ার পর শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি হতে হতে একপর্যায়ে তারা কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়। এই যে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছ, তোমরা কিন্তু এখন কৈশোরে আছ। একসময় তোমরাই শিশু ছিলে। তোমাদের শরীরের ক্রমাগত বড় হচ্ছে। শরীরের এই বড় হওয়া কিন্তু কেবল আমাদের উচ্চতায় বড় হওয়া নয়, আমাদের শরীরের যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে তারা সবাই কিন্তু বড় হচ্ছে। আমাদের বুকের ভেতরের হৎপিণ্ড (রক্ত সংবহনতন্ত্রের অঙ্গ), মাথার ভেতরের মস্তিষ্ক (ম্যায়ুতন্ত্রের অঙ্গ) কিংবা পেটের ভেতরের বৃক্ষ বা কিডনি (রেচনতন্ত্রের অঙ্গ)—এরা সবাই কিন্তু তোমাদের বেড়ে ওঠা শরীরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড় হচ্ছে।

বয়সের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে আমাদের শরীরের প্রজননতন্ত্রের দৃশ্যমান অঙ্গগুলোও কিন্তু বড় হতে থাকে। ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অঙ্গগুলো তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। একটু পরেই আমরা সেই পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে জানবো, কিন্তু তার আগে বলা দরকার, এই প্রজনন অঙ্গগুলো সম্বন্ধে আমাদের নতুন অনুভূতি তৈরি হয় কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতরের বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে। একটু আগে তন্ত্রসমূহের আলোচনায় আমরা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এসব গ্রন্থি থেকে এক ধরনের বিশেষ রাসায়নিক সংকেতবাহী পদার্থ নিঃসরণ হয় যাদেরকে আমরা সাধারণ নামে 'হরমোন' হিসেবে জানি।

কৈশোরের একপর্যায়ে নারী এবং পুরুষের শরীরে কিছু বিশেষ হরমোন তৈরি হওয়া শুরু হয়। নারী-পুরুষের শরীরভেদে আলাদা হয় বলে এসব হরমোনকে সেক্স হরমোন বা লিঙ্গ-ভিত্তিক হরমোন বলা হয়। মূলত আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে এসব সেক্স হরমোনের যে নতুন যোগাযোগ হয় তার কারণেই আমরা আমাদের বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গগুলোর ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠি।

সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে তোমাদের শরীরের যে পরিবর্তন তার সঙ্গে তোমাদের মন তথা মস্তিষ্কেরও কিন্তু একটি পরিবর্তন হচ্ছে, যা তোমাদেরকে প্রজনন বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিপৰ্কতার

দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রজনন বা জৈবিক পরিপক্ষতা মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত অর্জিত হয় ১৬-১৮ বছরের পর থেকে। কিন্তু সেই পরিপক্ষতার পথে যাত্রা শুরু হয় আরও আগে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১১-১৩ বছরের মধ্যে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯-১১ বছরের মধ্যে। এই যে বয়স, যখন মানুষ হিসেবে আমরা প্রজনন বিষয়ে পরিপক্ষতার দিকে যাত্রা শুরু করি, এই বয়সটাই হচ্ছে আমাদের বয়ঃসন্ধি। আমাদের শিশুকাল (জন্ম থেকে ৮-৯ বছর) পেরিয়ে যৌবনের (১৮ বছরের পরবর্তী) পর্যায়ে যাত্রার শুরুটা এই ৯-১৩ বছরের মধ্যে হয় বলেই এই সময়টাকে বয়ঃসন্ধি বলা হয়। বয়ঃসন্ধির সময়টায় শরীর ও মনের পরিবর্তনগুলো জীব হিসেবে মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এটা ও মনে রাখার বিষয় যে, বয়ঃসন্ধিতে শুরু হওয়া মানুষের শরীরের প্রজনন অঙ্গগুলোর দৃশ্যমান পরিবর্তন কিন্তু আরও কয়েক বছর ধরে চলতেই থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়। আর এসব কিছুরই পেছনে কাজ করে শরীরে তৈরি হওয়া সেক্ষ্র হরমোন।

বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের শারীরিক পরিবর্তন

ছেলেদের শরীরের বিকাশ ও দেহ গড়নের পরিবর্তন একটি দীর্ঘ সময় ধরে চলে। এই পরিবর্তন বয়ঃসন্ধি সময় থেকে শুরু করে ৩০ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। অনেক পরিবর্তন আছে যা বয়ঃসন্ধি শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। নিচে
বয়ঃসন্ধিকালীন কিছু পরিবর্তন তুলে ধরা হলো, যা তোমরা
নিজেদের শরীরেই লক্ষ করতে পারো।

গলার স্বরে পরিবর্তন: শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ছেলেদের বয়ঃসন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য আসলে আমরা শুনতে পাই। আর তা হচ্ছে তাদের গলার স্বরে পরিবর্তন। বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের গলার স্বর শিশু অবস্থার তুলনায় মোটা হয় যা তাদের শরীরের অন্যান্য পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত বহন করে।

দেহকাঠামো সুগঠিত হওয়া: ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির একটা বিশেষ লক্ষণ হলো শরীরের বিভিন্ন অংশ সুস্থাম ও সুগঠিত হতে থাকা। এই অংশগুলো হলো বুক, পিঠ, কোমর, নিতম্ব, উরু এবং পা। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত এই শারীরিক বিকাশ ঘটতে থাকে। মূলত এসময় ছেলেদের শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশি সুগঠিত হয়।



হাড়ের গঠন পরিবর্তন ও বৃদ্ধি: বয়ঃসন্ধি সময় থেকে ছেলেদের দেহের হাড়ের গঠন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একই সঙ্গে মজবুত কাঠামো লাভ করতে থাকে। শরীরের অনেক জায়গার হাড় চওড়া

হতে থাকে। এই পরিবর্তনও বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে ৩০ বছরের অধিক বয়স পর্যন্ত ঘটতে পারে।

শিশু (penis) ও অগুকোমের (testis) পরিবর্তন: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় তাদের শিশু ও অগুকোমের আকারে। শিশুর একটি সাধারণ কাজ হচ্ছে শরীরের ভেতর থেকে প্রবাহিত মূত্রনালির মাধ্যমে শরীরের বাইরে মূত্র নিঃসরণের পথ তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু প্রজননে ভূমিকা রাখাও এর আরেকটি কাজ। প্রজনন সংক্রান্ত কাজের জন্য শিশু প্রস্তুত হয় বয়ঃসন্ধিকালে। তখন এর আকার বৃদ্ধি পায়। সেক্ষে হরমোনের প্রভাবে শিশুর রক্ত ও অক্সিজেন প্রবাহিত বাড়ে ফলে এটি কখনো কখনো দৃঢ়তা অর্জন করে। শিশুর এই বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ১৮ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। শিশুর সাথে সাথে অগুকোমেরও পরিবর্তন হয়। অগুকোমে প্রজননের জন্য অপরিহার্য শুক্রাণু তৈরি হয় এবং জমা থাকে।

ছেলেদের মধ্যে ১৩ বছর বয়সেই আংশিকভাবে সক্রিয় শুক্রাণু দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ১৪-১৬ বছরের আগে পুরোপুরি সক্রিয়তা আসে না। যদিও, কারও কারো ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম: ছেলেদের বয়ঃসন্ধির অত্যন্ত সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজানো এবং তা ক্রমাগত ঘন হওয়া। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে ছেলেদের শিশুর মূলে লোমের উপস্থিতির মাধ্যমে। ইংরেজিতে একে বলা হয় পিউবিক হেয়ার (pubic hair) আর বাংলায় বলা হয় শ্রোণীদেশীয় লোম। আমাদের শরীরের উরুর গোড়া থেকে উপরের দিকে তলপেটের একটি অংশ বরাবর নিতম্বের অংশ নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে শ্রোণীদেশ (pelvis) বলা হয়। সাধারণত পুরুষের যৌনাঙ্গ বৃদ্ধি শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই এই পিউবিক হেয়ার বা শ্রোণীদেশীয় লোম দেখা যায়। বয়ঃসন্ধির পরবর্তীতে আরও উপরের অংশে এই লোম ছাড়িয়ে পড়ে।

পুরুষ-নির্দিষ্ট অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে মূলত শরীরে এই লোমের বিস্তার বাঢ়তে থাকে। যেমন—উপরের ঠোঁটের ওপরে ও নাকের নীচে গোঁফের রেশ তৈরি হয় এসময়। এছাড়া ধীরে ধীরে বগলের চুল, মুখে দাঢ়ির পাশাপাশি বুকসহ বিভিন্ন অঞ্চলেও লোমের উপস্থিতি দেখা যায়।

মেয়েদের ফ্রেঞ্চ শারীরিক পরিবর্তন

দেহের আকার, মেদ বৃদ্ধি: বয়ঃসন্ধিকালে মেদ কলার বৃদ্ধি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শরীরের বেশি অংশ জুড়ে ঘটে। মেয়েদের শরীরের যেসকল স্থানে সাধারণত মেদ কলার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তার মধ্যে আছে—স্তনগ্রস্থি, অধনিমাংশ, উরু, উপরের বাল্ব, এবং নিতম্ব অঞ্চল। এদের মধ্যে স্তনগ্রস্থিতেই সাধারণত সবচেয়ে বেশি মেদ জমা হয়। দশ বছর বয়সের একটি মেয়ের শরীরে একই বয়সের একটি ছেলের তুলনায় গড় চর্বির পরিমাণ থাকে মাত্র ৫% বেশি, কিন্তু বয়ঃসন্ধির শেষে এসে এই পার্থক্য হয় ৫০%-এর কাছাকাছি।

শরীরের বিভিন্ন অংশে লোমের উপস্থিতি: ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের কিছু কিছু অংশে লোমের উপস্থিতি দেখা যায়। এর মধ্যে শ্রোণীদেশীয় লোম (Pubic hair) বয়ঃসন্ধিতে

পৌঁছানোর সুস্পষ্ট লক্ষণ। প্রথমদিকে কেবল যোনিপথের চারপাশে ও উপরে হালকা ও ছোট লোমের অস্তিত্ব এলেও ধীরে ধীরে এই লোমের ঘনত্ব ও বিস্তার বাড়তে থাকে। বয়ঃসন্ধির পরেও এই বৃদ্ধি অব্যহত থাকে।

বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে হাতে, পায়ে, বগলে ও উরুতে চুলের অস্তিত্ব দেখা যায়। এটা সাধারণত ১৪-১৬ বছরের মধ্যে হয়। অনেক মেয়েদের মুখেও হালকা চুল গজাতে দেখা যায়।

স্তনবৃদ্ধি: মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে এক বা উভয় স্তনের বৃত্তের নিচে সাধারণত একটা শক্ত ও কোমল পিণ্ড দেখা যায়। এ ব্যাপারটা গড়ে সাড়ে ১০ বছর বয়সে ঘটে। পরবর্তী ৬-১২ মাসের মধ্যে স্তন উভয় পাশেই ফুলে নরম হয়ে ওঠে। এটি ঘটে মূলত স্তনের অঞ্চলে মেদ সঞ্চয়ের কারণে। এই বৃদ্ধি বয়ঃসন্ধির পরেও চলতে থাকে।

যোনিপথ, জরায়ু, এবং ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন: মেয়েদের হরমোন ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তাদের যোনিপথ, জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের গঠন ও কাজে পরিবর্তন আসে। শরীরের ভেতরে এই অঙ্গগুলো থাকে বলে এদের এই পরিবর্তন হয়তো খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে প্রথমদিকে যোনিপথ দিয়ে সাদা রংয়ের তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়, যা সাদা স্বাব হিসেবে পরিচিত)।

রজঃচক্র: সাধারণত সাদা স্বাব শুরু হওয়ার দুই বছর পরে যোনিপথ দিয়ে মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্বাব শুরু হয়। একে মাসিক বা পিরিয়ড বলা হয়। বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে মাসিক হওয়ার গড় বয়স ৯-১৩ বছর বলে ধরা হয়। নিয়মিত বিরতিতে মাসের নির্দিষ্ট সময়ে এই রক্তস্বাব হয় বলে এই ঘটনাটিকে রজঃচক্র বলা হয় (রজঃ শব্দটির অর্থই হচ্ছে রক্তস্বাব)। রজঃচক্র শুরু হওয়া মেয়েদের বয়ঃসন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এটি প্রজননের জন্য তাদের প্রস্তুতির পথে একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত।

শরীরের যত্ন

আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত এর যত্নের প্রয়োজন। কোভিড অতিমারির সময়ে আমরা বুরাতে পেরেছি যে, শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি আমাদের রোগ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেমন দরকার, তেমনি নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ নিশ্চিত করাও জরুরি। আমাদের কিছু সাধারণ অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহযোগিতা করে। যেমন—

- নিয়মিত গোসল করা;**
- হাত ও পায়ের নখ এবং চুল ছোট রাখা;**
- খাওয়ার আগে ও পরে এবং টয়লেট ব্যবহারের পরে সাবান নিয়ে হাত ধোয়া;**
- যেখানে সেখানে থুথু বা কফ না ফেলা;**
- হাঁচি ও কাশির সময়ে নাক ও মুখ রক্তাল বা টিস্যু বা হাতের কনুই দিয়ে ঢেকে রাখা।**

এসব আচরণ ও অভ্যাস আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য যেমন ভালো রাখে, তেমনি আমাদের চারপাশের

মানুষকেও সুস্থ থাকতে সহযোগিতা করে।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা যত্ন রয়েছে। আমাদের শরীরের যে অংশটুকু খোলা থাকে, তার যেমন যত্ন দরকার, তেমনি যে অংশটুকু পোশাকে ঢাকা থাকে তারও যত্ন দরকার। আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখতে হবে। আমাদের শরীরের ব্যক্তিগত কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঘাম ও ময়লা জমে জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। গোসলের সময় সাবান দিয়ে এসব অংশ পরিষ্কার করতে হবে।



খাবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমারা যেন সচেতনভাবে সুষম খাবার নির্বাচন করি তা খেয়াল রাখতে হবে। কেবল মুখে ভালো লাগলেই সে খাবার আমাদের শরীরের জন্য ভালো নাও হতে পারে। আমাদের সুস্থ শরীরের জন্য পুষ্টিকর খাবারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এছাড়া নিয়মিত ও সময়মতো ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। সুস্থ শরীরের জন্য এক দিনের মধ্যে আমাদের প্রায় আট ঘণ্টা ঘুম দরকার। রাত ৯-১০টার মধ্যে ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে। আর খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে আমাদের নিত্য দিনের কাজে নিযুক্ত হতে হবে।

আমাদের স্বাস্থ্যবিধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিয়মিত শরীরচর্চা। সময় করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে শরীরচর্চা করতে হবে। এসব অভ্যাস ও জীবনাচরণ আমাদের শরীর ও মন সুস্থ রাখতে সহযোগিতা করবে।

মানব শরীর অনেকগুলো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। এগুলোর সবকিছু আমরা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করি না। আমাদের অজ্ঞাতেও শরীর তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালিয়ে যায়, যা আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। তবে সচেতনভাবে আমরা যদি সঠিক যত্ন নিই, সঠিক খাবার খাই, নিয়মিত শরীর চর্চা করি, তবেই আমাদের শরীর থাকবে সুস্থ, সুবল ও কর্মক্ষম। তাই এসব বিষয়ে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অনুশীলনী

?

- ১। বয়ঃসন্ধিকালে তোমার মধ্যে যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো ঘটেছে বা ঘটছে তার সাথে কি বইয়ের তথ্যগুলোর কোন মিল দেখতে পাও?
- ২। নিজের শারীরিক ও মানসিক যত্নে তোমার কোন অভ্যেসটি তুমি পরিবর্তন করতে চাও?